



Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 154-159

UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ ভাবনা ও নারী চরিত্র নির্মাণ

পরমাশ্রী দাশগুপ্ত

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা ভারত

Abstract

From the later half of the nineteenth century, educated woman started taking part in political activities, which reflected on the literature as well. In the first half of 20th century Dijadralal Roy wrote his nationalist plays about colonial India. In his writing he put across the transformation of women's role in the political scenario of India. While developing the women character in his plays, he showcased a blend of traditional gender roles and nationalist awareness. And the same was the cause of popularity of his plays. In this article we will discuss about the character development of women in Dijandralal Roy's play and the purpose that it served in the light of the independence movement of India.

Keyword: gender, nationalism, tradition, awareness, popularity

এক

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বঙ্গীয় সমাজের এক শ্রেণির মেয়েরা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধে আত্মজীবনীতে নিজেদের আত্মসচেতনতার পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছিলেন। অন্ত:পুরের গৃহশিক্ষার দিন অতিক্রান্ত হচ্ছিল, বাড়িতে শিক্ষিত নারী থাকা যেন হয়ে উঠছিল সামাজিক প্রগতিশীলতার লক্ষণ। নারী শিক্ষা ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের এগিয়ে আসার পথে প্রচুর প্রতিবন্ধকতা থাকলেও সেইসময় অভিজাত কিছু পরিবার নতুন চেতনা ও জীবনবোধকে ধারণ করতে পেরেছিল। একারণেই আমরা দেখি ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নারীদের লেখা চারটি বই প্রকাশিত হয়েছিল।^১ যা উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বা তারও আগে আমরা দেখিনা। খ্রিষ্টান মিশনারি, নব্যশিক্ষিত জন, সমাজ সংস্কারক ও উদার মানবতাবাদী মানুষদের উদ্যোগে নারী শিক্ষা ক্রমশ বিস্তৃতি পায়। একই সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও নারীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। সমাজের একটা অংশের নারীদের পরিবর্তিত অবস্থান সেই সময়কার সাহিত্যকে নিশ্চিতভাবে গভীরে প্রভাবিত করেছিল। শিক্ষিত ও সচেতন নারীরা নিজেদের লেখায় তাদের অবস্থা উন্নতির কথা যেমন আলোচনা করেছিলেন তার সঙ্গে দেশের ও সমাজের সামগ্রিক উৎকর্ষ বৃদ্ধিই যে তাদের লক্ষ্য ছিল সেটাও তারা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রমেই পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতির সঙ্গে এই সমাজ সচেতন শিক্ষিত মহিলাদের অনেকেই জড়িয়ে পড়েন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় প্রথম থেকেই নারীরা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, রমাবাঈ, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, বিদ্যা গৌরীলীলকণ্ঠ, শ্রীমতি নিকম্বা এই পাঁচজন মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে অভিজাত শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের এক অংশ নারীমুক্তি আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ছিলেন সমাজের সেই বিশেষ শ্রেণিরই প্রতিনিধি। অভিজাত নারীদের যে সদ্য বিকশিত আত্মসচেতনতা ও ব্যক্তিত্ব তিনি দেখেছিলেন তারই প্রভাবে তিনি নির্মাণ করেছিলেন নারী চরিত্র। ভারতবর্ষে নারীমুক্তি আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলেছিল সমান্তরাল ভাবে আবার কখনো তা একই বিন্দুতে মিশে গিয়েছিল। সংস্কারমুক্ত নারীমুক্তিকামী মহিলারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কোন না কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বদেশপ্রেম, দেশোদ্ধার, স্বদেশের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার সংগ্রামের পাশাপাশি চলেছিল নারীদের অবস্থার উন্নতির পালা। বিশ শতকের একেবারে প্রথমদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন তার স্বদেশচেতনামূলক নাটকগুলি লিখলেন তখন তিনি এই ইতিহাসকেই ধারণ করতে চেয়েছিলেন। নারীদের যুগ মানসিকতাকে তিনি নাটকে তুলে আনলেন। তাঁর নির্মিত নারী চরিত্রে আত্মমর্যাদাবোধ, বলিষ্ঠতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল দেশপ্রেম, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও জোড়ালো মানবতাবাদ। সময় ও ইতিহাসকে এভাবেই চরিত্র নির্মাণের মধ্যে দিয়ে ধরতে চেয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল।

১

দ্বিজেন্দ্রলালের আগেই নারীদের নির্মিত নারী চরিত্রে উঠে এসেছিল আত্মসচেতনতা ও দেশপ্রেমের বার্তা। স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখায় নির্মিত নারীচরিত্রগুলির মধ্যে ছিল নারীত্বের গর্ব ও আত্মসম্মানের তেজ। কামিনী রায়ের লেখায় সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে আসার কথা আমরা পেলাম। তিনি রাষ্ট্রে ও সমাজে নারী পুরুষের সমান কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়েছিলেন। তাঁর ‘সিতিমা’ নাটকে যখন উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গিরিপদের রাজা বীরভদ্রের রাজ্য আক্রান্ত হয় তখন সিতিমা উদ্দীপক গান গায় ও নিজে বন্দীত্ব স্বীকার করে সেনাপতি উজ্জ্বল সিংহকে কারামুক্ত করে দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়। এই সমস্ত লেখিকাদের ভাবনা ও তাদের নির্মিত নারী চরিত্রগুলি নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছিল দ্বিজেন্দ্রলালকে।

উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকেই বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের বীজ ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় ইংরেজ বিদ্রোহ, স্বদেশ প্রেমের একটা সুর শোনা যাচ্ছিল। পরে সাহিত্যের মধ্যে এই ধারাটি আরো পরিপূর্ণ হয়। বঙ্গরক্ষণমঞ্চই সবার আগে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বলিষ্ঠভাবে ধারণ করেছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পন’ নাটকটি অভিনীত হওয়ার পর থেকেই একের পর এক স্বদেশচেতনামূলক নাটক অভিনয় চলতে থাকে। অনেকক্ষেত্রেই এই সব নাটক ছিল ইতিহাসাশ্রয়ী। ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়কে নাটকে, উপন্যাসে তখন তুলে ধরা হচ্ছিল। ইতিহাস থেকে যেন মানুষ শিক্ষা নেয়, এই ধরনের একটা উদ্দেশ্যও এর পিছনে কাজ করত। ইতিহাসের প্রেক্ষাপট নির্বাচন করে উপনিবেশপূর্ব ভারতবর্ষের অতীত চেহারাটা তুলে আনার চেষ্টা করতেন লেখকেরা সচেতন ভাবে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই ধারারই নাট্যকার তিনিও সমকালের ব্রিটিশদের সমালোচনা করলেন ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্বদেশ ভাবনামূলক বেশ কিছু ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন। ‘সরোজিনী’ (১৮৭৫) নাটকটি নায়িকা নামাঙ্কিত হলেও সরোজিনীর প্রভাব নাটকে তেমনভাবে জোড়ালো হয়ে ওঠেনি। ‘পুরুবিক্রম’, ‘সরোজিনী’ নাটকগুলোতে কখনও ইতিহাসাশ্রিত স্বদেশপ্রেমের থেকেও রোমান্টিক প্রেম বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। তবুও স্বদেশপ্রেমমূলক নাটক লেখার ধারাটি এভাবেই উনিশ শতক থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল যা বিশ শতকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখায় আরো তীব্র ও পরিপক্ব হয়ে ওঠে।

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য বিলেতে যান দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সেই সময় তিনি বিদেশে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় দেখেন এবং অভিনয় বিষয়টি তার কাছে প্রিয়তর হয়ে ওঠে।^২ ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করেন এবং ১৯০৫ - এ তা কার্যকরী হয়। ১৯০৬ সালে বাল গঙ্গাধর তিলক শিবাজী মেলার পত্তন করেন। বঙ্গভঙ্গের

প্রতিবাদে রাস্তায় নামে মানুষ। এই উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তার ঐতিহাসিক নাটকগুলি লিখেছিলেন। ওই একই সময় ঐতিহাসিক স্বদেশপ্রেম মূলক নাটক লিখছেন গিরিশ ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ক্ষীরোদপ্রসাদের চাঁদবিবি (১৯০৭), নন্দকুমার (১৯০৮), পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭) নাটকগুলি সেই সময়ের রাজনৈতিক আবেগকে গ্রহন করেই লেখা হয়েছিল। বোঝা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল যথেষ্ট প্রতিযোগিতার মধ্যেই নাটকগুলো লিখেছিলেন। তার নাটকগুলোর মঞ্চ সফলতারও অন্যতম কারণ হল যুগোচিত নারী চরিত্র নির্মাণ।

দুই

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মূলত আদর্শায়িত নারী চরিত্র গঠন করেছেন এবং তার সঙ্গে চিরাচরিত নারীত্বের ধারণার এক সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। যুগচিত দেশপ্রেমও এই চরিত্রগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নীতি, আদর্শ, সংস্কারগুলো সাধারণত পরিবারের মেয়েরাই ধারণ করে এবং আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি তাদের দ্বারাই রক্ষিত হয় তাই লেখকদেরও একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে নারী চরিত্রকে আদর্শায়িত করার। পুরুষ চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণত এই প্রবণতা দেখা যায়না। নারী চরিত্র আদর্শায়িত হয়ে তা পাঠকদের কাছে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে কারণ সংস্কারগুলো মূলত তারাই ধারণ করে এবং সমাজও তা অনুমোদন জানায়। এভাবেই পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোও প্রধানত সমাজে মেয়েদের দ্বারাই রক্ষিত ও বাহিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই সমাজ অনুমোদিত আদর্শায়িত নারী চরিত্র নির্মাণের লক্ষ্যে হেঁটেছিলেন। আত্মত্যাগ, সেবা, দয়া, ক্ষমা, স্নেহ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে চিরাচরিত নারীত্বের ধারণা সমাজে গড়ে উঠেছে দ্বিজেন্দ্রলাল সেটা পুরোপুরি সমর্থন করেছেন এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো যতটা সম্ভব নারী চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি স্বদেশ প্রেমের যুগগত চাহিদাকেও তিনি এড়িয়ে যাননি। নারীত্বের প্রথাগত ধারণাগুলি তার নাটকে কোনো প্রতিপ্রশ্নের মুখোমুখি হয়না আর এটা নিশ্চিতভাবে তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসফলতার একটা কারণ হতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বাস্তবনিষ্ঠ ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে নাটকগুলো লিখেছিলেন তাই নারীর সংস্কারমুক্ত প্রেমের কথাও তিনি প্রথম থেকেই বলতে পেরেছিলেন। ‘পাষণী’ (১৯০০) নাটকের অহল্যার চরিত্রে ও বক্তব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বীরঙ্গনার প্রভাব পড়েছিল। এই নাটকে আত্মসচেতন নারী অহল্যা বলেছে -

তুমি ও পুরুষ। সব পারে সে পুরুষ -
ঘুমন্ত পত্নীর গলে বসাইতে ছুরি,
কলঙ্কিতে পাতিব্রত, পাশব বিক্রমে;
নম্য নবোঢ়া; ছুঁড়ি দিতে বালিকার
প্রস্ফুটিত প্রেমপম লোকচার পদে;°

‘বীরঙ্গনা’ কাব্যের নারীরা যেভাবে দৃষ্ট ভঙ্গিমায় তাদের প্রতি অনাচারের প্রতিবাদ জানিয়েছে এই উক্তি অনেকটা সেইরকমই। ‘তারাবাই’ (১৯০৩) নাটকের তারাবাই -এর উক্তিতেও আমরা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার প্রভাব দেখি। তারা এই নাটকে বলেছে-

আমি নহি বিদ্যুৎ কি জ্যোৎস্না কি সঙ্গীত।
আমি মাত্র তারা। - দোষ আছে গুণ আছে।°

বোঝা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল তার পূর্বের ও সমসাময়িক লেখকদের নারী চরিত্র নির্মাণ কৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যদিও এই প্রভাব তিনি ক্রমশ কাটিয়ে ওঠেন এবং নারী চরিত্র নির্মাণের এক নিজস্ব ঘরানা তৈরি করেন। তার নাটকের নারীরা আদর্শময়ী, মানবতাবাদী, আত্মত্যাগী, সেবাপরায়ণ ও আত্মসচেতন।

৩

‘তারাবাই’ নাটকটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক হলেও একে ঠিক স্বদেশপ্রেমমূলক নাটক বলা ঠিক হবে না। তাঁর পরবর্তীকালে লেখা স্বদেশ চেতনামূলক ঐতিহাসিক নাটকগুলোর সঙ্গে এটির বেশ পার্থক্য আছে। পৃথ্বীরাজ ও

তারাবাইয়ের রোমান্টিক কাহিনিই নাট্যকারকে ‘তারাবাই’ লেখার প্রেরণা দিয়েছিল। পৃথ্বীরাজ চরিত্রের থেকেও তারাবাই চরিত্র এই নাটকে অনেক স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। তারাবাই ও তার মায়ের চরিত্রে রাজপুত্র রমণীদের শৌর্য ও বীরত্বেও পরিচয় তুলে ধরেছেন নাট্যকার। পুরুষবেশে তারাবাইয়ের শিকার যাত্রা ও চরিত্রিক দৃঢ়তা তার চরিত্রকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। তারাবাইয়ের কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে দেশপ্রেম। তারাবাই চরিত্রটি যে মডেলে তৈরি এই ধরনের নারী চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বদেশ প্রেমমূলক নাটকে পরেও নির্মাণ করেছেন। তারা-এ এই ধরনের নারী চরিত্র নির্মাণের সূচনা ধরা যায়।

তিন

টডের রাজস্থান থেকে কাহিনি নিয়ে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখলেন তার ‘প্রতাপসিংহ’ নাটকটি। এখানে ধর্ম, প্রেম, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা গড়ে তুলতেই তিনি ইরা, মেহেরউম্মিসা ও দৌলতউম্মিসা এই তিনটি চরিত্র নির্মাণ করেছেন। যা নাট্যকারের নিজস্ব মতবাদের প্রতিমূর্তি। ইরার কাছে দেশপ্রেমের চেয়েও মনুষ্যত্ব, পরোপকার বৃত্তি ও বিশ্বপ্রেম অনেক বড়। ইরার ইজিত্তে বার বারই এই চিন্তা ফুটে উঠেছে। ইরা চরিত্রের মধ্যে অনেকে ‘মেবার পতন’ নাটকের মানসী চরিত্রের পূর্বাভাস দেখেছেন। দৌলতউম্মিসা চরিত্রে নাট্যকার বিশ্ববিজয়ী প্রেমের মহিমাকে তুলে আনলেন আর মেহেরউম্মিসা চরিত্রটি সমাজ ধর্মের উর্ধে মনুষ্যত্বের জয়গান করে গেল। নাট্যকারের উচ্চতর ভাবাদর্শ চরিত্রগুলোকে গড়ে তুলেছে, এরা যেন রক্তমাংসের মানুষ নয়। এদের কাব্যধর্মী সংলাপ খুবই আরোপিত ও কৃত্রিম বলে মনে হয়।

১৯০৮ - এ লেখা ‘মেবার পতন’ নাটকটিকে নাট্যকার নিজেই বলেছেন ‘উদ্দেশ্যমূলক’।^৬ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন এই নাটকের নীতিই হল বিশ্বপ্রেমকে সামনে নিয়ে আসা এবং এর জন্য কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী যথাক্রমে দাম্পত্যপ্রেম, জাতীয়প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মূর্তি হিসাবে কল্পিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্য পূরণের তীব্রতায় নাটকের নাটকীয় গুণ অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের দ্রুতি ও ভিতরকার গলদ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন নাট্যকার আর তাই জাতিপ্রেম ও দেশপ্রেমের উপরে রেখেছিলেন বিশ্বপ্রেমকে। জাতীয়বার থেকে বড় করেছিলেন মনুষ্যত্বকে। এই নাটক মানসী কল্যাণীকে বলেছেন - “তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাণ্ড কর। সাত্ত্বনা পাবে। বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায়না; যোগ্য অযোগ্য বিচার করেনা। সে সেবা করে সুখী।”^৭ দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন -

আমি জানি, বিশ্বাস কবি, বেশ যেন দেখতে পাচ্ছি - যে যাই বলুক, যতই কেন

আমাদের নগন্য ও হেয় ভেবে উপেক্ষা করুকনা কেন - আমরা আবার জাগব, উঠব, মানুষ হব।

আমি ‘দেশ’ চিনিনা, বিদেঘ মানিনা আমি চাই শুধু বীর্যবল আর এই এককথায় মনুষ্যত্ব।^৮

চিঠির এই অংশটুকু পড়লেই বেশ বোঝা যায় নিজের বিশ্বাস ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তাঁর নিজের অবস্থান নির্মাণ করার জন্যই মানসী চরিত্রটির সৃষ্টি। চরিত্রটি এতটা আদর্শায়িত বলেই এতটা অবাস্তব। ‘মেবার পতন’ প্রকাশিত হওয়ার কয়েক মাস আগেই প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের আরো একটি ইতিহাসাপ্রিত নাটক নূরজাহান। যার ভূমিকায় নাট্যকার নিজেই লিখেছিলেন যে এই নাটকে তিনি দেব চরিত্র সৃষ্টি করার চেষ্টা করেননি। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকেই মুখ্য করে তুলেছেন। এই নাটকে নূরজাহানই প্রধান চরিত্র যাকে সত্যিই নাট্যকার আদর্শায়িত করার চেষ্টা করেননি এবং মনস্তত্ত্বের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা নূরজাহান দুটো নাটকেই তিনি চরিত্রগত ট্রাজিডি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

নূরজাহান সচেতন ভাবে জানতেন জাহাঙ্গীরের প্রতি তার কোনো আসক্তি বা প্রেম নেই। তার উচ্চাশা, আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা লিপ্সাই তাকে জাহাঙ্গীরের দিকে নিয়ে এসেছে। এমনকি শের খাঁর প্রতিও তার কোনো ভালোবাসা ছিলনা। নূরজাহান স্বগতক্তি করেছে -

- হায় উদার স্বামী! এই রূপই তোমার মৃত্যু সাধন করেছে। - এইরূপ, না আমার অকৃতজ্ঞ কঠিন হৃদয়? ... তোমায় ভালোবাসার জন্য নিজের সঙ্গে কি যুদ্ধ করেছে। বতু পার্লাম না। তাই তুমি অসীম বৈরাগ্যে মৃত্যুকে সেধে ডেকে নিলে। আমার উচ্চাশাই তোমার সর্বনাশ করেছে, আমারও সবনাশ করেছে।^৯

নূরজাহানের এই উচ্চাশার নামই জাহাঙ্গীর। এই উচ্চাশাকে সে আবার ‘শয়তানী’ ও বলেছে। এই ‘শয়তানী’কে সে দমন করতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি। সে প্রতি মুহূর্তে নিজের এই অবস্থাকে অনুভব করে। সে এক প্রেমঘন মুহূর্তে জাহাঙ্গীরকে বলেছে ‘আমি পিশচী’। নূরজাহান যে নিজে তার চরিত্রের এই স্থলন ও ক্রটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন তা এই রকম নানা সংলাপে উঠে এসেছে।

নূরজাহান চরিত্রের পাশাপাশি এই নাটকে রেবা চরিত্রটি নির্মাণ করা হয়েছে। ভারতের সাম্রাজ্যী রেবা নিজের স্বামী জাহাঙ্গীরকে এবং ভারতের অধীশ্বরীর সম্মানকে সহজেই ত্যাগ করতে পারে। সে প্রথম থেকেই নূরজাহানকে সব দিয়ে দিতে প্রস্তুত। রেবা নূরজাহানকে বলেছে -

শোন মেহের! তুমি ইচ্ছা করলেই সম্রাজ্যী হতে পারো। যে সে সম্রাজ্যী নয় - প্রধানা বেগম, ভারতের অধীশ্বরী যে সম্মান আজ আমি বহন করছি।^৯

এই আত্মত্যাগের মধ্যেই রেবার গৌরব। নূরজাহানও রেবের ক্ষমতার প্রতি উদাসীনতা দেখে হতবাক হয়ে যায়। রেবার মধ্যে নাট্যকার এক আত্মত্যাগী মহিলা চরিত্র নির্মাণ করেছেন। নূরজাহানের পাশে এই চরিত্র যথেষ্ট বৈপরীত্য তৈরি করেছে। দুটো ভিন্ন ধর্মী নারী চরিত্র গঠন করে নাট্যকার নূরজাহান চরিত্রের ক্রটি, অসামঞ্জস্য আরো ভালো করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

রেবার আছে হিন্দুত্বের গর্ব, ভগবানের উপর বিশ্বাস। রেবার নিষ্ঠার কাছে নূরজাহানের মাথা বারে বারে হেঁট হয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী নূরজাহানের চরিত্রের অসঙ্গতি এই বৈপরীত্য তৈরি করে পাঠকদের আরো ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার। নূরজাহান অনুভবও করেছে যে তার মধ্যে এক উচ্চাশা ও উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রাবল্য আছে, যা অন্যকেও ধ্বংস করে এবং কিছুটা আত্মধ্বংসও বটে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নারীর এই ধরণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির উদ্দামতাকে সমর্থন করতে পারেননি। নূরজাহান চরিত্রের ট্রাজিডির কারণও তিনি নির্দেশ করেছেন। তা হল এই চরিত্রের অন্তর্গত ক্রটি। নূরজাহান নাটকে নাট্যকার শেষ পর্যন্ত বলতে চাইলেন যে নারীকে তার গৃহ ও সংসার নিয়েই সুখি থাকতে হবে, সাম্রাজ্য নিয়ে নয়। নারীর কাছে সেবা এবং আত্মত্যাগই প্রার্থনীয়, অন্য কিছু নয়। আর এর মধ্যেই নারী জীবনের সম্পূর্ণতা। স্বামী ও মাকে পাশে নিয়ে লায়লার শেষ উক্তিটি এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যেখানে নাট্যকার লায়লার জবানীতে সংসারের বুকে নারীদের সংক্ষিপ্ত, প্রথাগত পরিসরটিকে চিনিয়ে দিয়েছেন। লায়লা বলেছে -

এসো মা, এসো স্বামী আমার। আমার মহবেদনার অশ্রুজলে তোমাদের দুঃখের ক্ষত ধুইয়ে দিই। - এইখানেই মেয়ের কাজ! এখানেই নারীর সাম্রাজ্য।^{১০}

উক্তিটির শেষ দুটি লাইন লক্ষণীয়। শেষ লাইনের আগের লাইনে যখন লায়লা বলেছে মা ও স্বামীর পাশে দাড়ানোই ‘মেয়ের কাজ’ তারপর বাক্যটি সমাপ্ত হচ্ছে বিশ্বয় বোধক চিহ্ন দিয়ে। আর শেষ লাইনে যখন এটাকেই নারীর সাম্রাজ্য বলা হচ্ছে তখন পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করা হল। পরিবারের নিকট মানুষের পাশে থাকা, সমবেদনা জ্ঞাপন এবং আত্মত্যাগেই নারী জীবনের সার্থকতা। এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন নাট্যকার। নূরজাহানের ভিতর এই বৈশিষ্ট্য ছিল না তাই সে ব্যর্থ হয়েছে। নাট্যকার যেন সমস্ত নাটকের শেষে এই লক্ষ্যেই পৌঁছাতে চেয়েছেন। সমাজ অনুমোদিত ভূমিকার বাইরে তিনি নারীকে দেখতে চাননি। নারীত্বের প্রথাগত ধারণাকে তিনি আঘাত করতে চাননি। নূরজাহান তার লিঙ্গভূমিকার বাইরে চলে এসেছিল তাই তার জীবনে বিপত্তি নেমে আসে। নাটকের শেষে লায়লার উক্তিতে এই লিঙ্গভূমিকাকেই নির্দিষ্ট করতে চাইলেন নাট্যকার। শেষে লায়লার কাছে তার পরাজিত মা যেন জননী বসুন্ধরা কেননা সে তখন হতবৈভব, ক্ষোভনম্রা, দুঃখিনী। আর তাই লায়লাও তার মার পাশে এসে দাঁড়ায়।

নূরজাহান নাটকে কোনো প্রথাভঙ্গার দিকে না গিয়ে নারীকে তার সমাজসিদ্ধ ভূমিকাতে দেখিয়ে দিয়েছিলেন নাট্যকার। আর এই চেতনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সাজাহান নাটকের জাহানারা চরিত্র। জাহানারাকে নাট্যকার যুগচিত বীরত্ব দিয়েছিলেন। সে অন্যান্য অসহিষ্ণু, দৃঢ়চেতা, যুক্তিবাদী, নৈতিকতা বোধ সম্পন্ন নারী। কিন্তু তার নিজের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। পিতা সাজাহানকে রক্ষা করা, তার পরিচর্যা এবং তার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনই যেন জাহানারার জীবনের লক্ষ্য। জাহানারার মধ্যে সমাজ স্বীকৃত নারীর কল্যাণময়ী রূপ পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ রায় তাঁর দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার গ্রন্থে জাহানারা চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন -

জাহানারা বীরাজনা - প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক আছে, কিন্তু এর জন্য তাঁর নারী সুলভ স্নেহ মমতা বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয়নি।”

সমালোচক যাকে বলেছেন ‘নারী সুলভ স্নেহমমতা’ সেটাই নারীর প্রথাগত লিঙ্গ পরিচয়। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জাহানারার যোগ ও তার চরিত্রে যুগচিত স্বদেশ ভাবনা সেই সময়ের নারীদের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রভাবে নির্মিত। নূরজাহানের মধ্যে এই ‘নারীসুলভ স্নেহমমতা’ ছিল না। প্রথাগত লিঙ্গ ভূমিকার বাইরে এসে সে দাঁড়িয়েছিল বলেই কি তার নাটকে এই বিপর্যয়? দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রায় প্রতিটি নারী চরিত্রই তাদের তেজস্বিতা ও দৃঢ়তা নিয়ে উজ্জ্বল। তাদের কোনো আত্মগ্রহণ নেই একমাত্র আত্মদহনে ভুগেছে নূরজাহান এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিতও হয়েছে। এই ভাবে নারী চরিত্র নির্মাণের মধ্যে দিয়ে লেখকের লিঙ্গ রাজনীতির এক প্রচ্ছন্ন চিত্র আমাদের সমানে উঠে আসে। নারী চরিত্রকে মহৎ করে নির্মাণ করার পিছনেও কখনও থেকে যায় এই লিঙ্গ রাজনৈতিক কৌশল।

‘সাজাহান’ নাটকের অন্যান্য নারী চরিত্রগুলোর কমবেশী এই একই ছাঁচে নির্মিত। পিয়ারা প্রেমিকা, প্রাণোচ্ছল নারী কিন্তু সেও যে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন তেজস্বী। আরাকান রাজা সূজাকে আশ্রয় দেওয়ার বিনিময়ে যখন পিয়ারাকে দাবী করে তখন পিয়ারাই তার স্বামীকে যুদ্ধ করতে বলেছে আরাকান রাজের সঙ্গে। পিয়ারা এও বলেছে যে সেও থাকবে পাশে এবং দুজনে একসঙ্গে মৃত্যু বরণ করবে। বীরাজনা নারী হিসাবে পিয়ারাও প্রতিষ্ঠিত। যোধপুর দুর্গে রাজা যশোবন্তের স্ত্রী মহামায়া স্বামীর কাপুরুষোচিত আদরণে ক্ষুব্ধ হয় এবং জন্মভূমি মড়বারের মহিমার কথা স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তারই নির্দেশে চারণ বালকেরা স্বদেশপ্রেমমূলক গান গায় ‘ধন্য ধান্যে পুষ্পে ভরা।’ মহামায়া চরিত্রে রাজপুর রমণীদের বীরত্ব প্রতিষ্ঠাও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশপ্রেমের ফসল। ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকের হেলেন চরিত্রের সঙ্গেও জাহানারা চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। সেও আদর্শবাদী, মানব কল্যানকামী ও পিতৃভক্ত। সেলুকাস কন্যা হেলেন আন্টিগোনাস্কে ভালোবাসলেও সে তাঁর পিতার ওপর খড়গ তুলেছিল বলে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আবার এই প্রত্যাখ্যানের ফলে যখন পিতার চোখে জল দেখেছে তখন আন্টিগোনাস্কে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে। যখন চন্দ্রগুপ্তের কাছে পিতা সেলুকাস পরাজিত হয়েছে এবং কন্যাপণে সন্ধির শর্ত এসেছে তখন সেলুকাস তা প্রত্যাখ্যান করলেও বৃহত্তর স্বার্থে হেলেন তা মেনে নিয়েছে। অপরের কল্যাণের জন্য সে নিজের হৃদয়ের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করেছে। এখানেও আত্মত্যাগ, স্নেহ, করুণা ইত্যাদি নারীত্বের প্রথাগত বৈশিষ্ট্য নিয়েই নির্মিত হয়েছে হেলেন চরিত্রটি।

চার

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশভাবনা ও নারী চরিত্র নির্মাণ আত্মসম্পর্কিত। নাট্যকারের স্বদেশভাবনা ও যুগচেতনা দিয়েই নির্মিত তার অধিকাংশ নারী চরিত্র। আবার এটাই তার নারী চরিত্র নির্মাণের শেষ কথা নয়। যে বৃহত্তর মানবতার আদর্শ তিনি মননে ধারণ করতেন তারও অভিজ্ঞান থেকে গেছে এই চরিত্রগুলোর মধ্যে। নারী চরিত্রগুলো তখনকার সমাজকে ধাক্কা দেয়নি নারী মুক্তির দিক থেকে, ধাক্কা দিয়েছিল স্বদেশ ভাবনায়, মানবতার প্রচারে। সমাজ রক্ষিত নারীত্বের ধারণা তারা ভাঙেনা বরং সমাজ তখন নারীদের জন্য যতটুকু পরিসর ছেড়ে দিয়েছিল সেইটুকুর মধ্যেই তাদের চলাচল। কোনো এক বৃহৎ স্বার্থের দিকে তাকিয়েই তাদের নির্মাণ, আত্মচিন্তা ও লিঙ্গ ভূমিকাকে অতিক্রম করার কোন সুযোগই সেখানে নেই।

উনিশ শতকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েরা কি লিখবে, কেমনভাবে লিখবে তা নির্ধারণ করে দিতে চেয়েছিল। সেই আদর্শ অনুসরণ করে যারা লিখেছিলেন তারাই বেশী গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন। সমাজ প্রকৃতপক্ষে নারীত্বকে নির্মাণ করে আর নারীদের উপর তা আরোপ করে। দ্বিজেন্দ্রলাল নারীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এগিয়ে আসা এবং তাদের রাজনৈতিক চিন্তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি সমাজ নির্ধারিত নারীত্বের সংজ্ঞার প্রতিও ছিল তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা। ফলে তার নির্মিত নারী চরিত্রে বীরত্ব ও নারীত্বের এক সংমিশ্রণ এবং সামঞ্জস্য আমরা লক্ষ্য করি। এই ভারসাম্য সমাজ সমর্থিত। সে যুগের কাছে কিছুটা প্রগতিশীল বললেও ভুল হবে না। উচ্চ ভাব আর উচ্চ আবেগকে নাটকে ধারণ করেছিলে বলেই এই নারী চরিত্রগুলো অনেকক্ষেত্রেই আদর্শায়িত। আর এটাই দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র নির্মাণের বিশেষত্ব। উপনিবেশ ক্লান্ত ভারতবর্ষের সামনে উচ্চ আদর্শ ও উচ্চ ভাবের দৃষ্টান্ত স্থাপন তখন জরুরি হয়ে পড়েছিল। সমাজ ও স্বদেশের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ‘জগৎ পালিনি! জগদ্ধারিনি! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ!’ তাঁর অন্তরের ধন। সেই ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়েই এই সৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই উদ্দেশ্যটিকে পাশে সরিয়ে রাখা যায়না। স্বদেশভাবনামূলক নাটকে এই লক্ষ্যটিই অবিচল ও উজ্জ্বল। বাকি সমস্ত কিছু তার অনুগামী মাত্র। আর এটাই যুগ প্রত্যাশিত ও যুগ অতিক্রমী।

সূত্র নির্দেশ ও মন্তব্য

১. ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে যে চারজন মহিলা স্বনামে নিজদের বই প্রকাশ করেছিলেন তারা হলেন - কৃষ্ণকামিনী দাসী, বামাসুন্দরী দেবী, হরকুমারী দেবী ও কৈলাসবাসিনী দেবী।
২. “বিলাতে যাইবার পূর্বে আমি ‘হেমলতা’ নাটক ও ‘নীলদর্পন’ নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখিন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত ‘সধবার একাদশী’ ও ‘গ্রন্থকার’ নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addison এর Cato এবং Shakespeare এর Julius Caesar - এর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অফিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গক্ষেত্র বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তম হইয়া উঠে।”
- আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ, নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭ রথীন্দ্রনাথ রায়, ‘দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবি ও নাট্যকার’, কলকাতা বাক্ সাহিত্য (প্রা. লি.), ১৪১৬, পৃ. ২০৫ - এ উদ্ধৃত।
৩. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ‘পাষণী’, *দ্বিজেন্দ্রচনাবলী* (প্রথম খন্ড), অষ্টম মুদ্রণ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০১২, পৃ. ৩২
৪. রথীন্দ্রনাথ রায়, *দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবি ও নাট্যকার*, কলকাতা বাক্ সাহিত্য (প্রা. লি.), ১৪১৬, পৃ. ৫৭
৫. ‘মেবার পতন’ - এর ভূমিকায় নাট্যকার বলেছিলেন -
“... এই নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি, সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্যপ্রেম, জাতীয়প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। ... অতএব এই আমার প্রথম উদ্দেশ্যমূলক নাটক।”
৬. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ‘মেবার পতন’, *দ্বিজেন্দ্রচনাবলী* (প্রথম খন্ড), অষ্টম মুদ্রণ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০১২, পৃ. ৩৪৭
৭. ২.৫.১৯০৬ এই তারিখে কাঁদি থেকে দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লেখা চিঠি রথীন্দ্রনাথ রায়, *দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবি ও নাট্যকার*, কলকাতা বাক্ সাহিত্য (প্রা. লি.), ১৪১৬, পৃ. ২৫৪
৮. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, *নূরজাহান*, কলকাতা, মুখোশ, ২০০৩, পৃ. ৪৫-৪৬

৯. ঐ, পৃ. ৫৩

১০. ঐ, ১৫৮

১১. রথীন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবি ও নাট্যকার, কলকাতা, বাক্ সাহিত্য (প্রা. লি.), ১৪১৬, পৃ. ২৮০